কর্মক্ষেত্রে নারীর সুরক্ষা

ম. জাভেদ ইকবাল

রাজধানী ঢাকার গুলশান এলাকার একটি নয় তলা ভবনের সপ্তম তলার পুরোটি জুড়েই জমকালো সজ্জার অফিসটির অবস্থান। ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশি বেজেছে। গুটি কয়েকজন ছাড়া কর্মীদের প্রায় সবাই অফিস শেষ করে বাড়ির পথ ধরেছেন। বিমর্ষড় মনে আর ক্লান্তমুখে নিজের ডেস্কে বসে আনমনে মোবাইল স্ক্রল করেই চলেছেন এক নারী। কানিজ ফাতেমা অরিন নামের নারী কর্মকর্তাটি প্রায় ১১ বছর হলো এখানে চাকুরি করছেন। স্বামী আর দুই সন্তান নিয়ে নগরীর বাড্ডা এলাকায় একটি ভাড়াকরা ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি। স্বামীও চাকুরি করেন রামপুরা এলাকার বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে। প্রতিদিন ভোররাতে উঠে পরিবারের সবার জন্য রান্না, বাড়ির গোছগাছ সেরে দুই ছেলেকে স্কুলের গেটে পৌঁছে দিয়ে দশটার মধ্যে অফিসে আসেন অরিন। ছেলেদের স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সাথে বাসায় থাকার জন্য একজন পঞ্চাশোর্ধ নারীকে কাজে রেখেছেন। বয়স্ক নারীটিরও পরিবার আছে, তাই সন্ধ্যা হলেই তিনি চলে যান। সেসময় কেবল ছোট্ট ছেলে দুটোই বাড়িতে থাকে। এটি নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ভোগেন অরিন। তাই অফিস সময় শেষ হলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চেষ্টা করেন। রাতের রান্না সেরে সাড়ে দশটায় পরিবারের চারজনই একসাথে খেতে বসেন। খাওয়ার সময়টুকুই যেন দিনের সেরা সময় হয়ে উঠে তাদের জন্য, প্রাত্যহিক জীবনের সবকষ্টই যেন এসময় দূর হয়ে যায় মন থেকে।

এগারো বছরের চাকুরিকালে ছয়জন অফিস প্রধানের অধীনে কাজ করেছেন অরিন। এতদিন সবকিছু ভালোই চলছিলো। কিন্তু বিপাকে পড়েছেন সম্প্রতি এখানে যোগ দেওয়া অফিস প্রধানকে নিয়ে। তিনি সকালে দেরি করে আসলেও অফিসে থাকেন রাত দশটা পর্যন্ত। অনেক সময় সন্ধ্যার পরে বাইরে থেকে এসে কয়েকজন বন্ধুও যোগ দেয় তার আড্ডায়। অফিস সময় শেষ হওয়ার পরে অরিন বাড়ি যেতে চাইলে অফিস প্রধান প্রতিদিনই আরও একটু থাকার জন্য বলেন, যদিও অরিনের টেবিলে অফিসের কোনো কাজ পড়ে থাকে না। আবার কয়েকদিন হলো অফিস প্রধানের কথা বলার ধরন, চোখের চাহনি ও মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত খাতির দেখানোর বিষয়গুলোর কারণে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন তিনি। এরকম চলতে থাকলে চাকুরিটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না সেটি নিয়েও সন্দিহান হতে হচ্ছে।

অরিনের মতো অনেক নারীকেই কর্মক্ষেত্রে মানসিক, শারীরিক বা ক্ষেত্রবিশেষে যৌন হয়রানির শিকারও হতে শোনা যায়। তাই কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা আজকের দিনে একটি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও নারীরা আধুনিক সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে, তবুও কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা, সমান সুযোগ এবং সুরক্ষা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েই গেছে। তাই এই যে এত অগ্রগতির পরও আমাদের ভাবতে হচ্ছে, নারীরা কী তাদের কর্মস্থলে আদৌ নিরাপদ? কর্মক্ষেত্রে তারা কী তাদের সমান সুযোগ-সুবিধা বা সুরক্ষা পাচ্ছেন? নাকি তাদের নারী হওয়াটাই এখানে বড়ো বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? এ পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে কিছু পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। কর্মক্ষেত্রে নারীরা যদি নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে তারা যেন কোনো ধরনের ভয়ভীতি ছাড়াই অভিযোগ করতে পারেন, তাই একটি গোপনীয় অভিযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের অভিযোগের পর যেন তদন্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং মার্জিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নারীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, সেমিনার বা গ্রুপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বপ্রথম সিসিটিভি ক্যামেরা ও নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা থাকা উচিত। এমনকি বিশেষভাবে নারীদের জন্য নিরাপদ গেটপাস, পার্কিং স্পেস এবং তাদের কাজের পরিবেশে যেন কোনো ধরনের ঝুঁকি দেখা না যায়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীকর্মীদের জন্য বিশ্রামের স্থান, শৌচাগার এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধা উপযুক্ত ও নিরাপদভাবে আছে কি না, সেদিকেও নজর দিতে হবে। নারীদের কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং নারীকর্মীদের পদোন্নতি, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূর করতে হবে। এ ছাড়া কর্মস্থলে পুরুষ ও নারীকর্মীদের মধ্যে কোনো ধরনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বা হেয়প্রতিপন্নকর কোনো কথা যেন না হয় সেদিকে কঠোরভাবে নজর দিতে হবে। একই সাথে নারীকর্মীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে জানাতে হবে। তারা যেন কর্মস্থলে কোনো ধরনের যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার না হন, এ ব্যাপারে তাদের সচেতন করতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৩৩২ ধারা অনুযায়ী যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তি কর্তৃক চাকরিরত কোনো নারীর সঙ্গে তার সম্মানের পরিপন্থী, অশালীন বা অশ্লীল হিসেবে গণ্য হতে পারে এমন আচরণ করা যাবে না। এই আইনের রূপরেখা অনুযায়ী নারীদের প্রতি হয়রানি ও বৈষম্য প্রতিরোধের জন্য কোম্পানি নীতিমালায় এবিষয়ক সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, নারীকর্মীদের সুরক্ষায় হুমকির বিষয়গুলো বহুমুখী হয়। তাই তার তদারকি প্রক্রিয়া এবং নিরসন পদ্ধতিও ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম হচ্ছে একটি নিবেদিত নারী সুরক্ষা সেল তৈরি করা। এই পরিষদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রোটোকল থাকা উচিত। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পরিষদে নারী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করা জরুরি। বিশেষ করে উচ্চপদস্থ জায়গাগুলোতে নারীদের উপস্থিতি নারীকর্মী ও চাকরিপ্রার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্তির অনুভূতি সৃষ্টি করবে। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো প্রভাবশালী পদে থাকায় নারী কর্মকর্তা পুরো প্রতিষ্ঠানের নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখতে পারবেন। প্রায় ক্ষেত্রে নারী কর্মচারীরা সহকর্মী বা বসদের অসংযত আচরণে লজ্জা ও আরও বেশি সম্মানহানির আশঙ্কায় হয়রানির ঘটনা প্রকাশে অনীহা পোষণ করেন। এমনকি ভুক্তভোগীদের চাকরি হারানোর ভয়ও থাকে। তাই এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত যেখানে পরিচয় গোপন রেখেই অভিযোগের সুযোগ থাকবে। অনেক নারীকর্মী মনে করেন, হয়রানিগুলোর জন্য কোনো বিচারই পাওয়া যাবে না; এরকম চিন্তা থেকেও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো আর প্রকাশ হয় না। এছাড়া দীর্ঘ প্রোটোকলের কারণে অনর্থক সময়ক্ষেপণের ফলে আস্থা হারিয়ে ফেলে ভুক্তভোগীরা। অন্যদিকে অপরাধী ব্যক্তি তার বিকৃত মানসিকতা অব্যাহত রাখতে সাহস ও প্রশ্রয় পেয়ে যায়। আবার, সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটার অফিস প্রথায় স্বাভাবিকভাবে কাজ শেষে বের হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে কাজের প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় অফিসে থাকতে হয়। তাই নিদেনপক্ষে অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে নারী কর্মীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব পরিবহণ সেবা দেওয়া উচিত। যাতে প্রতিদিন কাজ শেষে ভয় নিয়ে বাসায় ফেরাটা মানসিক অসুস্থতার দিকে পরিচালিত না করে।

আশার কথা হলো, ২০০৬ সালের শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং ২০০৯ সালের হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ কর্মস্থলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে একটি আইনের খসড়া করেছে এবং জমা দিয়েছে। এছাড়া, আইএলও কর্মস্থলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গাইডলাইনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা কর্মস্থলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প। রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশই অর্জিত হয় এই খাত থেকে। তৈরি পোশাক শিল্পখাত ২.৫৯ মিলিয়ন কর্মীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে, যার মধ্যে ৫৭ শতাংশ নারীকর্মী। নারীকর্মীরা এই খাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন লাভ করেছে, তবুও তারা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও যৌন-হয়রানিসহ কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিশেষ করে যাতায়াতে নানাবিধ সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমাদের দেশ থেকে অনেক নারী প্রবাসে কাজের জন্য যান। এই রেমিট্যান্স-যোদ্ধা নারীকর্মীদের জন্য দেশ ছাড়ার আগে বাধ্যতামূলক ‘নিরাপত্তা ও অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ’ চালু করা, প্রতিটি বাংলাদেশ দূতাবাসে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইনসহ ‘নারী সহায়তা ডেস্ক’ চালু এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিপীড়নের শিকার নারীকর্মীদের দেশে ফেরার পর পুনর্বাসন, মানসিক ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত। অনুরূপভাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে নারী শ্রমিক প্রেরণে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা, প্রবাসী নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে বেতন ও মর্যাদার সমতা নিশ্চিত করা, সহিংসতা গোপনে জানাতে ‘ডিজিটাল রিপোর্টিং অ্যাপ’ চালু করা, প্রতারক নিয়োগকারী এজেন্সির বিরুদ্ধে কঠোর মনিটরিং ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, যৌন সহিংসতার শিকার নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক কল্যাণ তহবিল গঠন করা, নারী কর্মীদের পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র ও যোগাযোগের মাধ্যম নিজেদের কাছে রাখার অধিকার নিশ্চিত করা, আইএলও কনভেনশন-এ সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ‘নারী’- এই একটা শব্দেই যেন নিহিত থাকে গোটা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তোলার এক অনন্য শক্তি। পৃথিবীর প্রত্যেকটা কোণায় নারীরা তাদের সাধনা ও পরিশ্রম দিয়ে সমাজে এক অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। নারী যে শুধু একজন মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ে- বিষয়টা তা নয়, বরং নারী হলো একজন শিল্পী, লেখক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, নেত্রী এবং উদ্ভাবক। যুগে যুগে নারীরা তাদের দক্ষতা, মেধা, শ্রম এবং সাহস দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তারা শুধু পরিবারের আঙিনায় নয়, বরং কর্মক্ষেত্রেও তাদের অবদান অশেষ। বর্তমানে নারীরা শুধু সহকারী ভূমিকা পালন করছেন না বরং তারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্ভাবনারও সূচনা করছেন। তাই সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তার গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু কর্মস্থলে নারীদের নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। যখন আমরা সবার জন্য একটি নিরাপদ, সমান এবং উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি করতে পারব, ঠিক তখনই আমাদের সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে গড়ে উঠবে। তাই নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু নারীকে নয় বরং পুরো সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তাই কর্মস্থলে নারীর সুরক্ষা হোক উন্নত সমাজ গঠনের একটি উপায়।

#

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।

পিআইডি ফিচার